রসতীর্থ-পথের পথিক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদক: ড. সুব্রত চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক: ড. কাজী সাকেরুল হক
ড. রমেশ চন্দ্র মণ্ডল
পুষ্পেন্দু বিকাশ সাহু
নয়ন শীট

রসতীর্থ-পথের পথিক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা
ড. সুব্রত চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদকঃ ড. কাজী সাকেরুল হক
ড. রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, পুষ্পেন্দু বিকাশ সাহু, নয়ন শীট

অনুভূতি
প্রকাশন

RASATIRTHA - PATHER PATHIK (2ND PART)

A Collection of Bengali Essay

Edited by Dr. Subrata Chakraborty
Sub-Editors: Dr. Kazi Sakerul Haque,
Dr. Ramesh Chandra Mondal, Puspendu Bikash Sahoo

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

গ্র ন্থ স্ব ত্ব ঃ লেখক

প্র চ্ছ দ ঃ সন্তু কর্মকার

নি বে দ ক ঃ

প্র কা শ ক
অমর মিশ্র কর্তৃক
অনুভূতি প্রকাশনের পক্ষে
কুলিদা, বামনদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, সূচক-৭২১৪২৬

প্রকাশ সহযোগী ঃ গীতা রাণী মিশ্র

ISBN ঃ 978-93-6102-357-6

বি নি ম য় ঃ তিনশত আশি টাকা (৩৮০)

ব র্ণ স্থা প ন ও মু দ্র ণ
অনুভূতি প্রিন্টার্স, ৬৫/২ বাসুদেবপুর রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬, থেকে মুদ্রিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন কিংবা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের গ্রাফিক্‌স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সূচিপত্র

শব্দের পৃথক প্রমাণত্ব প্রতিষ্ঠাঃ ন্যায় মত সমীক্ষা ১৩
স্বর্ণা বিশ্বাস
অলঙ্কার- কাব্যের প্রাণ রসের উপকারক ২১
ডঃ পূর্ণিমা জানা
বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব ৩১
ড. পরমেশ আচার্য
ভারতীয় রসতত্ত্বের আলোকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য আখ্যানের পুনঃপাঠ ৩৬
ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য
জীবনরসের আলোকে আবু ইসাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ' ৪৫
অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী
শাক্তপদাবলী : রস প্রসঙ্গ ৫১
ডঃ শিপ্রা ভট্টাচার্য
কাব্য-পরিমিতি : কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রসভাবনা ৫৮
মহম্মদ ওমর
কবি জসীমউদ্দীনের 'রাখালী' : পল্লীমানুষের জীবনরসের লোকগাথা ৬৫
ড. কাজী সাকেরুল হক
অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের রসবিচার ৭৭
হাসিনা খাতুন
নবরসধারায় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ৮৭
ড. সাগরিকা ঘোষ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে রস প্রকাশ ৯৬
ড. বর্ণালী গাঙ্গুলী
মনোজ মিত্রের 'রঙের হাট' নাটকে হাস্যরস ১০৩
অরূপ সিং
এবং ইন্দ্রজিৎ : অদ্ভুত রসের আস্বাদ ১০৯
সৌমাল্য নায়ক
EXPLORING VEER RASA: HEROISM AMIDST CULTURAL CONFLICT I N CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE'S NARRATIVE 'HALF OF A YELLOW SUN' ১১৫
Dr. Paramita Bhaduli
Arms and the Man: A Rasa Approach ১২৪
Subhadeep Samanta
রাজশেখর বসুর নির্বাচিত ছোটগল্পঃ ভারতীয় রসদর্শনের আলোকে ১৩২
ড. দীপক সোম

নির্ণয় ও নিরীক্ষণে নবরসে নবায়মান নয় কাহিনি ১৪৭
ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
বিমল করের গল্প : মানবমনের অন্তর্নিহিত জটিলতার স্বরূপ ও তার রসপ্রকাশ ১৫৪
ড. সেখ সাব্বির হোসেন
বলবান জামাতা, রসময়ীর রসিকতা : হাস্যরসের উৎসার ১৬২
রিক্তা সামন্ত
রসতত্ত্বের আলোকে মতি নন্দীর নির্বাচিত ছোটগল্প; 'একটা খুনের খবর', 'শবাগার' ১৭০
মিনতি মণ্ডল
রসবৈচিত্র্যের আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : 'সমুদ্র' ও 'গিরগিটি' ১৭৮
সেখ আসিক ইকবাল হোসেন
পরশুরামঃ বাংলা হাস্যরস সাহিত্যের এক জ্যোতিষ্ক ১৮৬
সুতনু দাস
'পটলডাঙার পাঁচালী' ঘৃণিত বস্তিজীবনের বীভৎস রস : অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের কাহিনী ১৯১
ড. রাকেশ জানা
'শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়' উপন্যাসের রস-বিচার ২০৭
ড. সুলেখা সরদার দাস
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসের রসবিচার ২১৩
মানবেন্দ্র নাথ মাজী
রসের আলোকে "কৃষ্ণকান্তের উইল" ২২৪
অনিল কুমার খাটুয়া
প্রফুল্ল মাহাতোর 'ধরম বেটা' উপন্যাসে প্রতিফলিত বাৎসল্য রস ২৩১
স্বপন রানা
রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দুখে কেওড়া' : রস বিচার ২৩৮
সত্যজিৎ সরকার
বালক রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বপরিচয় : একটি প্রেক্ষিত ২৪৪
অভি কোলে
A Harmony of Mind with the help of 4E Dimensions of COGNITION ২৫২
Sangita Chanda
বৈষ্ণবীয় রস-তত্ত্বালোকে তারাশঙ্করের 'রাধা' ২৫৯
প্রীতম মাইতি
'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের হাস্যরস ২৬৩
দুর্গা রাণী মাইতি
আধুনিকতার আলোকে রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী গল্পের নায়িকাঃ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২৭১
মাম্পি মণ্ডল

পথের পাঁচালী উপন্যাসের রস বিচার ২৮২
কথাকলি গোস্বামী
প্রতিবন্ধকতা চর্চা ও তত্ত্বের প্রয়োগ : পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে ২৮৮
চিরঞ্জিত ঘোষ
সে গল্প গ্রন্থের হাস্যরস ২৯৭
সুপ্রীতি মাইতি
ঐতিহাসিক রসে্ সমৃদ্ধ কয়েকটি বাংলা উপন্যাস ৩০০
প্রেমাঙ্কুর মিশ্র
জীবনরস-ধারায় রবীন্দ্র ছোটগল্পঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৩০৮
ডঃ রমেশ চন্দ্র মন্ডল
রসতত্ত্বের আলোকে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ৩১৪
ড. রশ্মি অধিকারী
নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা নানা রসের অপূর্ব সংমিশ্রণ ৩১৮
ড. রেজওয়ানুল ইসলাম
ভারতীয় রসদর্শনের আলোকে "তুঙ্গভদ্রার তীরে" ৩২৩
প্রদীপ সামন্ত

বালক রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বপরিচয় ঃ একটি প্রেক্ষিত

অভি কোলে
(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ)

রবীন্দ্রনাথ কবি। অথচ তাঁর জীবনের প্রথম ধারাবাহিক রচনা বিজ্ঞান নিয়ে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসী পাহাড়ে থাকাকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। নক্ষত্রলোকের যাবতীয় সন্ধান তাঁকে দিতে সচেষ্ট হতেন। পিতৃদেবের মুখে যা শুনতেন তা বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় লিখতেন। 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"তিনি (মহর্ষিদেব) যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।"[১]

১৮৭৩ সালের মে-জুন মাসে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বারো বৎসর বয়সে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আরও অজস্র লেখা আছে। এই বিষয়ে সজনীকান্ত দাস মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন—

"পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি।"[২]

এই প্রবন্ধটিকে বাদ দিলে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সামুদ্রিক জীব' রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের শেষে লেখকের স্বাক্ষর স্থলে আছে 'ভঃ'। ভানুসিংহ নামের অপভ্রংশ এটি হতে পারে। সজনীকান্ত দাস এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

"জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ বাদ দিলে এইটিই রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।"[৩]

এই প্রবন্ধের কয়েকটি স্থান থেকে ভাষার নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে—

"এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত

অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল। স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। ... এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে।"[৪]

এই প্রবন্ধে যেমন কীটানুদিগের সম্বন্ধে বালক রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তেমনই ক্রমবিবর্তনের জগতে কোন্‌স্থানে উদ্ভিদ পর্যায় থেকে বিচ্যুতি এসে জীবের সূচনা হলো সেটাও আশ্চর্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের এই জটিল তত্ত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। লেখকের কোনো নাম নেই। প্রবন্ধগুলি হল— 'পৃথিবীর পরিণাম', 'নক্ষত্র', 'আলোক', 'ভূ-গর্ভ', 'পৃথিবীর উৎপত্তি', 'ভূ-কম্পন' ইত্যাদি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বালক' (১২৯২) পত্রিকার প্রথম বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' শিরোণামে বারোটি ছোটো প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে কবির ভাষার নমুনাটি এইরূপ—

"জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোন জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ক কাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ চতুর্দ্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।"[৫]

১২৯৮ বঙ্গাব্দে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকাতে কবি 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' শিরোণামায় বিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব নিয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ সালের 'সাধনা'র পৌষ সংখ্যায় কবি 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন সেটিই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 'পাঠপ্রচয়' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধটিতে শারীরবিজ্ঞান ও জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জীবাণুরা রোগ সৃষ্টি করে এই কথা কবি বলেছেন তাঁর নিজস্ব নৈপুণ্যে—

"জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।"[৬]

আবার, রক্তের লোহিত কণিকা সম্বন্ধে কবি বলেছেন—
"ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই- আসলে বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিতকণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিতবর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকট রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়; অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না।"[৭]

১৩০০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সাধনা'য় তাঁর রচিত 'ঈথর' প্রবন্ধটি মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। এই পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য' নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাময়িক সারসংগ্রহ' এই শিরোণামায় অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হতো। এই প্রবন্ধে পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কবির সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় নিহিত আছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার সামান্য অংশ তুলে ধরছি—
"প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাকশন বশতঃ সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাবে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।"[৮]

১৩০১ বঙ্গাব্দের 'আশ্বিন ও কার্তিক' সংখ্যায় 'সাধনা' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' নামে একটি শীর্ষক বড়ো রচনা করেন। দৃষ্টান্ত—
"আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জপদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়, ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।"[৯]

চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা' সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৩০১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ সংখ্যায় যথাক্রমে 'পঞ্জিকার ভ্রম', 'দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি' এবং 'জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্ধারণ' নামে তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের কোনো নাম ছিল না।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ৭ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে 'ভান্ডার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম দিককার সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ) 'সঞ্চয়' শিরোনামার অন্তর্গত তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' এবং 'বিনা তারে টেলিগ্রাফ' প্রবন্ধ দুটিতে কোনো লেখকের স্বাক্ষর নেই। দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞানসভা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—
"স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার

করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রকাশ করিতে পারিবে না।"[১০]

দ্বিতীয় সংখ্যার 'সঞ্চয়' অংশে তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে 'জ্যোতিঃশাস্ত্র', 'এন-তেজ' এবং 'কুয়াশা নিবারণের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকের কোনো নাম নেই। ঐ সংখ্যার 'আষাঢ়' সংখ্যায় 'সৌর-কলঙ্কের কার্য'; 'হিমোগ্লোবিন'— এই প্রবন্ধদুটিও লেখকের নামবিহীন। 'শ্রাবণ' সংখ্যার 'জীবের উৎপত্তি', 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' প্রবন্ধ দুটিতেও একই অবস্থা। 'জীবতত্ত্ব' ও 'জ্যোতিঃশাস্ত্র' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তবে এগুলি তাঁর রচনা কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় কবি আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। 'সঞ্চয়' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার জগৎ' বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ রসগ্রাহী প্রবন্ধ।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আষাঢ়' সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম 'খাদ্য চাই'। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, এখানে পুষ্টিকর আহারের অভাব, এদেশের মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না, এই কারণেই কর্তব্যে বিমুখ। অপরদিকে ঐ পত্রিকায় 'আশ্বিন ও কার্তিক' সংখ্যায় 'আহারের অভ্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর মত—

"আজও যে সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ আছে তাহাদের পুষ্টিকরতা বিচার করিয়া লওয়া এখন আমাদের কর্তব্য। এককালে যে সকল খাদ্য প্রধান-খাদ্যের পারিপার্শ্বিক মাত্র ছিল এখন তাহারাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অভ্যাসকেই তুষ্ট করিয়া শরীরকে হনন করা চলিতেছে। শুধু তাই নয়, পূর্বে আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট ছিল, তাই নানা প্রকার তরকারী রাঁধিবার আয়োজন তখন সহজেই হইত। এখন তেমন বিচিত্র আয়োজনে পাত সাজাইবার জোগাড় করিতে যে সময় ও উদ্যোগ খরচ করা হইতেছে সেটার মত অপব্যয় আর নাই।"[১১]

জীবনের উপান্তে উপনীত হয়ে বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তীব্রতম হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য অনেককে উদ্বুদ্ধ করেন। মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে ১৯৩৭ সালে রচনা করলেন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের প্রবন্ধ নিয়ে রচিত অনবদ্য গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়'। গ্রন্থটি বিশ্বশ্রুত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থটির ভূমিকা অতীব মূল্যবান। বিজ্ঞানাচার্যের কাছে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা থেকে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি কবির মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল নয়, আজকের দিনে প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কার সম্পর্কে

অবহিত থাকা। কবি স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন, বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। অতঃপর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে।

বয়সের ভার ও শরীরের অপটুতা সত্ত্বেও জীবনের প্রান্তসীমায় এসে কেন তিনি তাঁর অল্প পরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তার কারণ বর্ণনা করে কবি বলেছেন, তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সর্বমোট পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে— 'পরমাণুলোক', 'নক্ষত্রলোক', 'গ্রহলোক', 'সৌরজগৎ' ও 'ভূলোক'। এছাড়া আছে উপসংহার। তিনি সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। রচনার কোথাও ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ একের পর এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ পরিবেশন করেছেন অতি দ্রুতভাবে। বক্তব্যের বিষয় অনুসারে স্থান সংকীর্ণ। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ সম্পর্কে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে এক পত্রে লিখেছেন—

"ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে সাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোন কথা নেই। বিজ্ঞান সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাব এমন আশা করি নে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চন্দ্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিন্তু হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কানে উঠেছে। মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন জাদুবিদ্যা ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব।"[১২]

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ একদিকে হল বিচার-বিশ্লেষণের দিক, আর অন্যদিকে হল কল্পনা অনুভূতির গহন বিপুল রসার্ণবের উদার বিস্তৃতিতে আত্মহারা। এই গ্রন্থে দুটোরই মিলন ঘটেছে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে ভাষার জাদু দুই-ই সার্থকভাবে বর্তমান।

'বিশ্বপরিচয়'-এর ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, যারা বৈজ্ঞানিক সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে রইল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল। প্রাচ্যের কণ্ঠে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুর যে সুগম্ভীর তানের সৃষ্টি করে, তার স্বরলিপি 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের প্রতিটি ছাত্রে। গ্রন্থের 'পরমাণুলোক' প্রবন্ধে 'রেডিয়াম' সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

"অবশেষে একদিন, কী কারণে কেউ জানে না, রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আল্ফা রশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি ন্যুট্রনের সংযোগে তৈরি। ... কিন্তু তার যে পরমাণু থেকে একটা আলফা

কণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তার মেয়াদ প্রায় দিন-চারেকের। তারপরে তার থেকে পরে পরে স্ফোরণ ঘটতে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে।"[১৩]

'সৌরজগৎ' প্রবন্ধেও একই মন্তব্য—

"সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্তদেশে পৌঁছয় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়-কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় এফ ২ (F2) স্তর। সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নিচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে। সেখানেও পরমাণু ভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে এফ ১ (F1) স্তর। আরো নীচে ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরো একটা যে স্তর দেখা দেয়, তার নাম ই (E) স্তর।"[১৪]

'ভূলোক' প্রবন্ধে পরিভাষার সৃষ্টিতে কবির সহজ প্রয়াস লক্ষণীয়। কবি বিজ্ঞানের বহু শব্দের পরিভাষা করে গেছেন। প্রিজম্‌কে বলেছেন 'তিন পিঠওয়ালা কাঁচ', Ultra violet ray-কে বলেছেন 'বেগুনি-পারের আলো', nfra red।। ght-কে 'লাল-উজানী আলো', troposphere-কে ক্ষুব্ধস্তর, Stratosphere-কে স্তব্ধস্তর এমনি নানা পরিভাষা নাম দিয়েছেন। পরিভাষার দিকে খুব বেশি জোর দেবার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেননি, যেহেতু—

"পরিভাষা চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবি। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যার এলাকাও সীমাহীন। বহুর মধ্যে একত্বকে প্রতিপন্ন করেছে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম, জটিল তথ্য কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিকে দিয়েছে এক বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। একের পর এক সেই রহস্যের কুজ্ঝটিকা উন্মোচিত করে চলেছে বিজ্ঞান। কবি আনন্দিত, বিস্মিত জ্ঞানের সেই জ্যোতির্লোকে বিচরণ করে। বিজ্ঞানের আনন্দ কবির স্নিগ্ধ লেখনীর স্পর্শে ঘনীভূত হয়েছে সান্দ্ররসে।

শিল্পী যেমন মণিমুক্তা দিয়ে রচনা করে কারুচিত্র, তেমনি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের মণিমুক্তা জহরত দিয়ে কবি রচনা করেছেন নিখিল বিশ্বের এক অপূর্ব আলেখ্য। 'বিশ্বপরিচয়'কে বলা যেতে পারে নব্যবিজ্ঞান গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের এক অধ্যায়। আমাদের আহ্বান করে কবি বলেছেন— 'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশাদ্য সচরাচরম।'

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের ভাষা অনুকরণ করা শক্ত। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের ভাষা কতটা কাব্যমন্ডিত হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। এই গ্রন্থের হালকা আমেজ পাঠককে দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে হাঁফ ধরিয়ে দেয় না— বরং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। ভাষা যেন হাল ফ্যাসানের অলংকার দিয়ে তৈরি রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, কোথাও ঠোক্কর খায়নি,

থমকে দাঁড়াতে হয়নি— তথ্যের যাথার্থ্যের কোন অবমাননা তো হয়-ই নি, বরং চলবার সময়ে অলংকার-শিঞ্জিনী শোনা গেছে— তাতে ঝিমুনির হাত থেকে রচনা বেঁচে গেছে। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে একই সঙ্গে সহজ ও সজীব করে তোলা দুর্লভ শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাজ। শুধু তো হলেই চলবে না, নীর থেকে ক্ষীর তুলতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরাজিকে সাহিত্যের সৌন্দর্যালোকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার শক্তি। তার জন্যে চাই বিজ্ঞানের অধিকার এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপম ক্ষমতা। বিজ্ঞানের কঠিন অঙ্গ থেকে রস নিঙড়ে বের করা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য কর্ম। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বিজ্ঞানী, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে লেখা ভূমিকাতে তিনি সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন—

"অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জিত বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হলো না। ... যাই হোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।"[১৬]

তবে একথা সত্য যে, কবির মৃত্যুর তেরো বছর পরে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ সহজবোধ্যভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা জোরালো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কখনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে যশোলাভ করতে চাননি। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর যে জ্ঞান ছিল তাতে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই বিরাট দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন উত্তরসূরী সাহিত্যরসিক বিজ্ঞানীদের উপরে।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, (১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক- শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- পৌষ, ১৩৯৬, পৃ. ৫২২।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, ঊনবিংশ খণ্ড, প্রকাশক- রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- মাঘ ১৪২২, পৃ. ৭।
৩. সজনীকান্ত দাস, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী পত্রিকা, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, সামুদ্রিক জীব, পৃ. ৭৭।
৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বালক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, পৃ. ১২৪।
৬. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা পত্রিকা, পৌষ সংখ্যা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পাঠপ্রচয়, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৩৩।
৭. তদেব, পৃ. ৭৮।

৮. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য, পৃ. ৬৫।
৯. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ, পৃ. ৪৮।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, বিজ্ঞান সভা, পৃ. ১২৩।
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, আহারের অভ্যাস, পৃ. ৩০।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪৬।
১৫. তদেব, পৃ. ৫২১।
১৬. প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্র রচিত সাহিত্যের ভূমিকা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪।